

Origin of Life in Indian Philosophy and Modern Science: A Review ভারতীয় দর্শনে ও আধুনিক বিজ্ঞানে জীবের উৎপত্তি : একটি সমীক্ষা

Dr. Raspoti Mandal (ড. রাসপতি মণ্ডল)

Assistant Professor, Department of Philosophy, Bangabasi College, Kolkata, West Bengal, India.

Email - raspoti24mandal@gmail.com

Abstract: According to Ārambhavāda, whatever is produced in the world did not exist before; it comes into being as something entirely new. This doctrine is chiefly upheld by Nyāya-Vaiśeṣika, which maintains that cause and effect are completely distinct entities and that the effect is a fresh production. In contrast, Pariṇāmavāda holds that nothing is absolutely new; rather, what appears as new is only a transformation of a pre-existing cause. This view is supported by Sāṃkhya and Yoga, where the evolution of the universe is explained through the interaction of Prakṛti (nature) and Puruṣa (consciousness). Further, Vedānta emphasizes Vivartavāda, which proposes that all creation emerges from a single ultimate reality, Brahman, and manifests through gradual transformation or appearance. This presents a notion of spiritual evolution that, while distinct, can be compared philosophically with Evolution as articulated by Charles Darwin. These three doctrines occupy a central place in Indian philosophical thought: Ārambhavāda supports creation as a new beginning, Pariṇāmavāda explains transformation, and Vivartavāda accounts for apparent evolution or manifestation. The origin of the living body is explained through the combination of the five fundamental elements (Pañca Mahābhūta). According to these philosophical systems, the body is a material entity governed by natural laws, yet life itself is animated by the presence of the self. The principal components are: (a) Ātman (Self) – the conscious principle underlying life, associated with the body; (b) Manas (Mind) – an atomic, subtle entity mediating between senses and self; (c) Pañca Mahābhūta (Five Elements) – earth, water, fire, air, and ether forming the physical body; (d) Karma – past actions determining the formation and course of life; (e) Adhiṣṭhāna Śakti – the organizing principle responsible for structure and development.

Key Words: Pañca Mahābhūta, Guṇatraya, Ārambhavāda, Pariṇāmavāda, Vivartavāda and Scientific Perspective.

আমরা জানি জীবাত্মার দেহের এক এক অংশে পঞ্চভূতের এক এক ভূতের প্রাধান্য। দেহযন্ত্রের সবার নিচে পৃথিবী। তার উপরে অপ। তেজ বা অগ্নির স্থান নাভির কাছে, যেখানে জ্বলে উঠে জঠর অনল। বায়ুর স্থান বুকে যেখানে রূদপিণ্ড দিয়ে শ্বাস নিই। ব্যোমের স্থান কণ্ঠে। ব্যোম থেকে শব্দ হয়। শব্দ হয় কণ্ঠ থেকেই। হাত আর পা দুই-ই দেহযন্ত্রের বাইরে। সুতরাং, তার কোনো নির্দেশ নেই তত্ত্বে। তবে পৃথিবীর নিচে রসাতল বলে দুই পায়ের স্তরে স্তরে অনেকে ধরেছেন রসাতলকে। পৃথিবীর চক্র হলো মূলধার। তার উপরে অচক্র স্বাধিষ্ঠান, তেজচক্র, মণিপুত্র, বায়ুচক্র অনাহত এবং ব্যোমচক্র বিশুদ্ধ। এই ভূত জগতের উর্দ্ধে রয়েছে তুরীয়াতীত জগৎ, যে জগতের রঙ নেই, গন্ধ নেই, স্পর্শ নেই-আছে সকল বর্ণের আধার স্বেত হয়ে। অর্থাৎ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মাতীতে অর্থাৎ কারণে যাবার পথ হিসেবে। স্থূল থেকে সূক্ষ্মাতীতের পথের শেষে ব্রহ্মরন্ধ্রে, তত্ত্বে যাকে বলে অকারণ কারণের বিচিত্র বিলাস।

জীবাত্মার ক্ষেত্রে স্থূল জগৎ তথা শরীর তৈরি পঞ্চভূত দিয়ে। পঞ্চভূতের এক একটি ভূতের সঙ্গে জীবাত্মার ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক গুণানুসারে। গন্ধ হলো ক্ষিত্বের বিশেষ গুণ, ক্ষিত্ব ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যে গন্ধ থাকে না — “ব্যবহৃতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ।”^১ জলে আমরা গন্ধ অনুভব করি, এই কারণে যে, জলের সঙ্গে ক্ষিত্বের কিছু অংশ মিশ্রিত হয়। ক্ষিত্বিমিশ্রিত জলেরই গন্ধ আছে, বিশুদ্ধ জলের কোনো গন্ধ নেই। রস হলো জলের বিশেষ গুণ, রূপ হলো তেজের বিশেষ গুণ, স্পর্শ হলো বায়ুর বিশেষ গুণ এবং শব্দ হলো আকাশের বিশেষ গুণ। আমাদের পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা এই বিশেষ গুণগুলিকে প্রত্যক্ষ করি। এক একটি ইন্দ্রিয় এক একটি গুণকে প্রত্যক্ষ করে। যে ইন্দ্রিয় যে ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূত থেকে উৎপন্ন। যেমন — ঘ্রাণেন্দ্রিয় ক্ষিত্ব থেকে উৎপন্ন, রসেন্দ্রিয় জল থেকে উৎপন্ন, দর্শনেন্দ্রিয় তেজঃ থেকে উৎপন্ন, স্পর্শেন্দ্রিয় বায়ু থেকে উৎপন্ন ও শ্রবণেন্দ্রিয় আকাশ থেকে উৎপন্ন। অনন্ততঃ তাঁর ‘তর্কসংগ্রহে’ ইন্দ্রিয়ের কোনো লক্ষণ প্রদান না করলেও ‘তর্কসংগ্রহদীপিকা’ টীকায় ইন্দ্রিয়ের একটি সুসংহত লক্ষণ নির্ধারণ করেছেন — “শব্দেতরোভূতবিশেষগুণানাশ্রয়ে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্।”^২ অর্থাৎ যা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের আশ্রয় নয় এবং জ্ঞান উৎপত্তির কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয়, তাই ইন্দ্রিয়। এই লক্ষণটি ধাপে ধাপে সংশোধনের মাধ্যমে নির্দোষ রূপ লাভ করেছে। প্রথমে যদি শুধু বলা হয় যে যা জ্ঞানের কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় তাই ইন্দ্রিয়, তবে আত্মাতেও এই লক্ষণ প্রযোজ্য হয়, কারণ ন্যায়-বৈশেষিক মতে আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংযোগে প্রত্যক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং আত্মাও মনঃসংযোগের আশ্রয়; ফলে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এই ত্রুটি দূর করতে ‘বিশেষ গুণানাশ্রয়’ পদ যুক্ত করা হয়, কারণ আত্মা ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন,

১. ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমিত। বৈশেষিক দর্শন (সম্পাদিত)। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২২, পৃঃ ৭৫।

২. গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। তর্কসংগ্রহঃ (অনন্ততঃ)। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২২।

सुख, दुःख ও জ্ঞান— এই ছয় বিশেষ গুণের আশ্রয়, ফলে আত্মা ইন্দ্রিয় নয়। কিন্তু এতে আবার অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়, কারণ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পাঁচ ভৌতিক ইন্দ্রিয় পঞ্চভূতজাত হওয়ায় বিশেষ গুণের আশ্রয় হয়। তাই ‘উদ্ধৃত’ বিশেষণ যোগ করে বলা হয় যে ইন্দ্রিয় উদ্ধৃত বিশেষ গুণের আশ্রয় নয়। কিন্তু শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশজাত এবং শব্দ (উদ্ধৃত বিশেষ গুণ)–এর আশ্রয় হওয়ায় আবার অব্যাপ্তি ঘটে; এই কারণে ‘শব্দেতর’ বিশেষণ সংযোজন করা হয়। আবার ‘জ্ঞানকারণ’ শব্দটি না থাকলে কাল (সময়) মনঃসংযোগের আশ্রয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হতো, কিন্তু কাল মনঃসংযোগের আশ্রয় হলেও তা জ্ঞান উৎপত্তির কারণ নয়, তাই ‘জ্ঞানকারণ’ পদটি প্রয়োজনীয়। একইভাবে ‘মনঃ’ শব্দটি না থাকলে চক্ষুসংযোগকেও জ্ঞানকারণ ধরা যেতে পারে এবং কাল তার আশ্রয় হওয়ায় আবার অতিব্যাপ্তি ঘটত, তাই ‘মনঃসংযোগ’ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং, উপরোক্ত সমস্ত দোষ পরিহার করে ইন্দ্রিয়ের নির্দোষ লক্ষণ স্থির হয়েছে। অপরদিকে, ‘বিষয়’–এর লক্ষণ তর্কসংগ্রহে না থাকলেও দীপিকায় বলা হয়েছে — “শরীরেন্দ্রিয়ভিন্নো বিষয়ঃ।”^৩ অর্থাৎ যা শরীর ও ইন্দ্রিয় থেকে ভিন্ন তাই বিষয়; এখানে ‘বিষয়’ শব্দটি সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন মৃত্তিকা বা প্রস্তর। পরিশেষে বলা যায়, পার্থিব শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়— এই তিনটিরই একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো গন্ধের উপস্থিতি, এবং এই গন্ধধর্মিতাকেই যথাক্রমে তাদের লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়।

‘আরম্ভ’ শব্দের অর্থ হলো উৎপত্তি বা শুরু (Beginning)। এই ধারণা থেকেই এসেছে ‘আরম্ভবাদ’। আমরা সাধারণত ‘আরম্ভ’ শব্দটি তখনই ব্যবহার করি, যখন আগে কোনো কিছুর অস্তিত্ব আমাদের কাছে প্রকাশিত ছিল না, কিন্তু হঠাৎ তা প্রথমবারের মতো প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ যা আগে ছিল না, পরে হলো— এই অবস্থাকেই ‘আরম্ভ’ বলা হয় — “অপ্রবৃত্তস্যাদ্য প্রবৃত্তিঃ। যথা সৃষ্ট্যারম্ভঃ।”^৪ অর্থাৎ যা আগে শুরু হয়নি, তার প্রথম শুরু হওয়াই আরম্ভ; যেমন সৃষ্টির শুরু।

‘পরিণাম’ শব্দটি ‘পরি’ উপসর্গ এবং ‘ণম’ ধাতুর সঙ্গে ‘ঘঞ’ প্রত্যয় যোগে গঠিত। ‘ণম’ ধাতুর অর্থ নমন বা নতি। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কোনো বস্তু সূক্ষ্ম বা অদৃশ্য অবস্থা থেকে স্থূল বা দৃশ্যমান অবস্থায় প্রকাশ পেলে, অথবা আগের ধর্ম বা গুণের অবসান হয়ে নতুন ধর্ম বা গুণ প্রকাশ পেলে, সেই পরিবর্তনকে পরিণাম বলা হয়।

অন্যদিকে ‘বিবর্ত’ শব্দের অর্থ হলো কোনো কিছুর বিশেষ বা ভিন্ন রূপে প্রতিভাস হওয়া। সদানন্দ তাঁর ‘বেদান্তসার’-এ বলেছেন — “অতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ।”^৫ অর্থাৎ পূর্বের আসল রূপ ত্যাগ না করে যে মিথ্যা বা ভ্রান্ত নানারূপে প্রতিভাস ঘটে, তাকে বিবর্ত বলা হয়। এর উদাহরণ হিসেবে বলা যায়— কিন্নুককে (শুক্তি) রূপা বলে মনে হওয়া বা দড়িকে সাপ বলে ভ্রম হওয়া। এখানে আসল বস্তু বদলায় না, কিন্তু আমাদের জ্ঞানে অন্যরূপে প্রতীয়মান হয়— এটিই বিবর্ত। কিন্তু যখন কোনো বস্তু তার পূর্বের রূপ ত্যাগ করে অন্য রূপ ধারণ করে, তখন তাকে পরিণাম বলা হয়। যেমন— দুধ থেকে দই হওয়া। এখানে দুধ তার আগের অবস্থায় থাকে না; নতুন রূপ ধারণ করে।

যোগবিশিষ্ট রামায়ণ এবং তার টীকায় কারণ থেকে কার্যের উৎপত্তিকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করা হয়েছে— ১) অতিরোহিত প্রাগবস্থ, ২) প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ, ৩) প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ, ৪) অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ ও ৫) বিনষ্ট প্রাগবস্থ। অতিরোহিত প্রাগবস্থ বলতে বোঝায় যেখানে পূর্বের অবস্থা লোপ পায় না। যেমন— মাটি থেকে ঘট তৈরি হলে মাটির অস্তিত্ব নষ্ট হয় না; সেটি ঘটের মধ্যেই থাকে। প্রতিবদ্ধ প্রাগবস্থ হলো এমন অবস্থা, যেখানে পূর্বের অবস্থা নষ্ট না হয়ে সাময়িকভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন— জল খুব ঠান্ডা হয়ে বরফ হলে জলের স্বরূপ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় না; তাই বরফ আবার গলে জল হতে পারে। প্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ বলতে বোঝায় যেখানে পূর্বের অবস্থা আচ্ছন্ন বা লুকায়িত থাকে। যেমন— অন্ধকারে দড়িকে সাপ মনে হলে দড়ির প্রকৃত স্বরূপ ভ্রমের কারণে আড়ালে চলে যায়। অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ হলো এমন অবস্থা যেখানে পূর্বের রূপ স্পষ্টভাবেই থাকে। যেমন— জলের থেকে তরঙ্গ সৃষ্টি হলে জল অদৃশ্য হয় না; বোঝা যায় যে জলই তরঙ্গাকারে উঠছে। আর বিনষ্ট প্রাগবস্থ হলো এমন অবস্থা যেখানে পূর্বের রূপ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যেমন— দুধ থেকে দই হওয়া। এখানে দুধ তার আগের অবস্থায় আর ফিরে আসে না। এই ধরনের পরিবর্তনকেই বিকার বা পরিণাম বলা হয়। ঋষি বিশিষ্ট বলেছেন যখন কারণ থেকে এমন কার্যের উৎপত্তি হয় যাতে কারণের স্বরূপই পরিবর্তিত হয়ে যায়, তখন তাকে পরিণাম বলা হয়। কিন্তু যখন কোনো বস্তুর আসল স্বরূপ অপরিবর্তিত থাকে এবং কেবল ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়, তখন তাকে বিবর্ত বলা হয়। বিবর্তের ক্ষেত্রে কারণের প্রকৃত স্বরূপ নষ্ট হয় না; তাই সেই অবস্থাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা কঠিন নয়। বিশিষ্টদেব বলেছেন— অতিরোহিত, প্রতিবদ্ধ, প্রচ্ছন্ন এবং অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ— এই চার ধরনের কার্য উৎপত্তি বিবর্তের অন্তর্গত, আর বিনষ্ট প্রাগবস্থ হলো বিকার বা পরিণাম।

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও এর সঙ্গে কিছু মিল দেখা যায়। বিজ্ঞানে পরিবর্তনকে সাধারণত প্রাকৃতিক (Physical change) এবং রাসায়নিক (Chemical change)— এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। বিশিষ্টদেবের অতিরোহিত, প্রতিবদ্ধ ও অপ্রচ্ছন্ন প্রাগবস্থ— এই তিন ধরনের বিবর্তের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের কিছু মিল আছে। আর বিনষ্ট প্রাগবস্থ বা পরিণাম রাসায়নিক পরিবর্তনের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন— মাটি থেকে ঘট তৈরি হয়, তেমনি কাপড়ের সুতো থেকে কাপড়ের সৃষ্টি হয়। নৈয়ায়িকদের মতে ঠিক সেইভাবেই পরমাণু থেকে পৃথিবীসহ সমগ্র জগতের সৃষ্টি বা আরম্ভ হয়েছে। এখানে মাটি ঘটের উপাদান কারণ (যে বস্তু থেকে জিনিসটি তৈরি হয়)। আর কুমোর, দণ্ড ও চাকা ইত্যাদি হলো নিমিত্ত কারণ। ঠিক তেমনি, পরমাণুসমূহ হলো বিশ্বজগতের উপাদান কারণ, আর ঈশ্বর, কাল, দিক এবং অদৃষ্ট ইত্যাদি হলো নিমিত্ত কারণ। যেমন— মাটির মধ্যে আগে থেকেই ঘট দেখা যায় না, তেমনি পরমাণুর মধ্যেও ব্যক্ত জগত আগে থেকে প্রকাশিত অবস্থায় থাকে না— নৈয়ায়িকরা এটিই মনে করেন। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের মত ভিন্ন। সাংখ্য মতে, যেমন দুধ থেকে দই তৈরি হয়, তেমনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণবিশিষ্ট প্রকৃতি (প্রধান) থেকে ধীরে ধীরে মহতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব ইত্যাদির সৃষ্টি হয়, এবং শেষ পর্যন্ত তা বিচিত্র বিস্তরূপ ধারণ করে। সাংখ্য দার্শনিকদের মতে, যা একেবারেই নেই (অসৎ), তার থেকে কিছুই জন্ম নিতে পারে না। আবার যা আছে (সৎ), তার সম্পূর্ণ বিনাশও সম্ভব নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন — “নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত্যঃ।”^৬ তাই অসৎ থেকে সত্যের সৃষ্টি হতে পারে না। এই কারণে সাংখ্য দর্শন কার্যকে পূর্ব থেকেই সৎ বা বিদ্যমান বলে মানে। এজন্য তাদের মতকে সংকার্যবাদ বলা হয়। অন্যদিকে ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন অসৎকার্যবাদী অর্থাৎ তাদের মতে কার্য আগে থেকে বিদ্যমান থাকে না; পরে সৃষ্টি হয়। আর বেদান্ত দর্শনের মতে, এক অখণ্ড ও একরস পরমাত্মা নিজের মায়াক্রান্তির মাধ্যমে আকাশ ইত্যাদি জগৎরূপে প্রকাশিত হন। তাই বেদান্ত দর্শনকে বিবর্তবাদী বা সংকার্যবাদী বলা হয়। এখানে কারণ (ব্রহ্ম) সত্য ও নিত্য, কিন্তু জগৎ বা কার্য মিথ্যা বা অনিত্য।

সাংখ্য দর্শনে সংকার্যবাদ প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে— প্রথমত, যা একেবারেই নেই, তার প্রকাশ বা উৎপত্তি সম্ভব নয়। কেউই অসৎকে সৎ করতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যে বস্তু থেকে অন্য কোনো বস্তু তৈরি হয়, তাকে তার উপাদান কারণ বলা হয়। যেমন— মাটি ঘটের উপাদান কারণ, আর সুতো কাপড়ের উপাদান কারণ। কিন্তু মাটি থেকে কাপড় বা সুতো থেকে ঘট তৈরি হয় না। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্যের একটি নির্দিষ্ট উপাদান কারণ থাকে— এটা মানতেই হবে। তৃতীয়ত, কার্য তার উপাদান কারণের সঙ্গে প্রকাশের আগেই সম্পর্কযুক্ত থাকে। যদি বলা হয় কার্য প্রকাশের আগে কারণের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, তাহলে কারণ-কার্যের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকবে না। তখন যে কোনো বস্তু থেকে যে কোনো জিনিস তৈরি হতে পারত, যা বাস্তবে দেখা যায় না। চতুর্থত, আমরা কার্য দেখে তার মধ্যে থাকা শক্তির অনুমান করি। সব বস্তু থেকে সব কার্য

৩. গৌস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। *তর্কসংগ্রহঃ (অন্নংভট্ট)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২২।

৪. ঝালকীকর, ভীমাচার্য। *ন্যায়কোশঃ* বারানসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০২১, পৃঃ ১২৯।

৫. অমৃতত্বানন্দ, স্বামী। *বেদান্তসারঃ (অনুবাদ ও টীকা)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮, পৃঃ ৮৭।

৬. রামসুখদাস, স্বামী। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা*। গোরখপুর: গীতা প্রেস, ২০১১, পৃঃ ৭১।

হয় না। যে বস্তুর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কার্য করার শক্তি আছে, সেই বস্তুই সেই কার্য করতে পারে। এই শক্তির প্রকাশিত অবস্থাকেই কার্য বলা হয়। অর্থাৎ কার্য মূলত কারণের শক্তির প্রকাশ। তাই বলা যায়, কার্য শক্তির রূপ, আর শক্তি কারণের মধ্যে অবস্থিত। এই কারণে কার্য আসলে তার উপাদান কারণ থেকে স্বরূপত ভিন্ন নয়। যখন কার্য কারণ থেকে আলাদা নয়, তখন যদি কারণকে সং বা বিদ্যমান বলা হয়, তবে কার্যকেও সং বলতেই হবে। কারণ, সং কারণ থেকে অসং কার্য জন্মাতে পারে না। কার্য যে কারণ থেকে ভিন্ন নয়, তার প্রমাণও আছে। যে বস্তু অন্য কিছুর থেকে ভিন্ন, তা তার ধর্ম (গুণ) হতে পারে না। কিন্তু কার্য কারণের ধর্ম বা প্রকাশ। তাই কার্য কারণ থেকে ভিন্ন নয়।

সংকার্যবাদীরা যে যুক্তি দিয়ে সংকার্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন তা সংক্ষেপে জানা গেল। এখন অসংকার্যবাদীরা যে যুক্তি দিয়ে তাদের মত প্রতিষ্ঠা করেন তা আলোচনা করা হচ্ছে। আস্তিক দর্শনগুলির মধ্যে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন অসংকার্যবাদ গ্রহণ করে। এই মত অনুযায়ী— কার্য উৎপত্তির পূর্বে বিদ্যমান থাকে না। অর্থাৎ কার্য আগে থেকে কারণের মধ্যে উপস্থিত থাকে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে আপত্তি উঠতে পারে, মহর্ষি গৌতম নিজেই প্রথমে সেই আপত্তিগুলি উত্থাপন করেন। প্রথম আপত্তি হলো— প্রত্যেক কার্যের একটি নির্দিষ্ট উপাদান কারণ থাকে। যেমন— ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা। আবার অবিদ্যমান বস্তুর সঙ্গে বিদ্যমান বস্তুর সম্পর্ক হতে পারে না। তাই বলা যায় না যে উৎপত্তির পূর্বে কার্য ছিল না। কিন্তু আবার এটাও সত্য যে— ঘটের উৎপত্তির আগে ঘট বিদ্যমান ছিল— এই কথাও কেউ সহজে মানতে চান না। এইভাবে দেখা যায়—

১) কার্য আগে থেকেই ছিল—এই মতও পুরোপুরি যুক্তিসঙ্গত নয়।

২) কার্য একেবারেই ছিল না—এই মত নিয়েও সন্দেহ থাকে।

তবু মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করেন— উৎপত্তির পূর্বে কার্য বিদ্যমান থাকে না, এটিই সঠিক মত। কারণ ‘উৎপত্তি’ ও ‘বিনাশ’ শব্দের অর্থ বিচার করলে বোঝা যায়— যে বস্তু আগে অবিদ্যমান বা অনভিব্যক্ত ছিল, পরে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা প্রকাশিত হয়, তাকে উৎপত্তি বলে। আর যে বস্তু আগে প্রকাশিত ছিল, পরে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে বিনাশ বলে। যদি ধরা হয় যে কার্য আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাহলে উৎপত্তি ও বিনাশের ধারণা অর্থহীন হয়ে যায়। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখি যে ঘট, পট ইত্যাদি বস্তু উৎপন্ন হয় এবং পরে নষ্টও হয়। তাই কার্যকে আগে থেকেই বিদ্যমান বলা যায় না।

সংকার্যবাদীরা আবার আপত্তি করেন, যদি কার্য আগে না থাকে, তাহলে যে কোনো বস্তু থেকে যে কোনো বস্তু উৎপন্ন হতে পারে। তখন নির্দিষ্ট উপাদান কারণের প্রয়োজন থাকবে না। এই আপত্তির উত্তরে মহর্ষি গৌতম বলেন— সকল বস্তু সকল বস্তুর কারণ হতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব স্বভাব বা প্রকৃতি আছে, এবং সেই স্বভাবের কারণেই নির্দিষ্ট বস্তু থেকেই নির্দিষ্ট কার্য উৎপন্ন হয়। যেমন— তাঁতী যখন সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করেন, তখন তিনি এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ করেন না যে কাপড় আগে থেকেই সুতোর মধ্যে আছে। বরং তিনি জানেন যে সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করা সম্ভব, তাই সেই কাজ করেন। যদি তিনি ভাবতেন কাপড় আগে থেকেই সুতোর মধ্যে প্রস্তুত আছে, তাহলে কাপড় তৈরির জন্য আর কোনো চেষ্টা করতেন না। কারণ যা আগে থেকেই সিদ্ধ, তার জন্য মানুষ চেষ্টা করে না। অতএব এই যুক্তি থেকে বোঝা যায়— কারণের কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগে কার্য বিদ্যমান থাকে না। এই সিদ্ধান্তই অসংকার্যবাদ।

‘অভিব্যক্তির আগে কার্য বিদ্যমান থাকে’— এই কথার অর্থ এই নয় যে, কার্য আগে থেকেই ব্যক্ত বা প্রকাশিত অবস্থায় থাকে। যেমন— ঘট তৈরি হওয়ার আগে মাটির ভিতরে ঘটের আকারে তা থাকে না— এটা সহজেই বোঝা যায়। সংকার্যবাদের আসল কথা হলো— কার্য প্রকাশ পাওয়ার আগে তার কারণের মধ্যে শক্তিরূপে সম্ভাবনা হিসেবে থাকে। অর্থাৎ কার্য তখন প্রকাশিত নয়, কিন্তু সম্ভাবনা হিসেবে কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। প্রকাশ না পাওয়ার জন্যই আমরা তখন তাকে উপলব্ধি করতে পারি না।

এবার বিরোধীরা প্রশ্ন করেন— ‘অভিব্যক্তি’ বা প্রকাশ কি আগে থেকেই সং, না অসং? যদি বলা হয় অভিব্যক্তি আগে থেকেই সং, তাহলে সুতো দেখলেই কাপড়কে উপলব্ধি করা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। তাই বলা যায় না যে অভিব্যক্তি আগে থেকেই সং।

সংকার্যবাদীরাও বলেন না যে অভিব্যক্তি আগে থেকেই সং। কিন্তু যদি বলা হয় অভিব্যক্তি আগে অসং ছিল এবং পরে উৎপন্ন হলো, তাহলে প্রশ্ন ওঠে— অসং থেকেও তো উৎপত্তি সম্ভব বলে মানতে হবে। তখন অসংকার্যবাদও মানতে হয়। এর ফলে সংকার্যবাদের যুক্তিতে কিছু দুর্বলতা দেখা যায়।

সংকার্যবাদীদের মতে প্রকৃতি বা প্রধানই বিশ্বজগতের উপাদান কারণ। কার্য মূলত কারণেরই রূপ অর্থাৎ কার্য কারণ থেকে আলাদা নয়। তাই বলা যায়, বিশ্বজগত প্রকৃতি থেকেই প্রকাশিত। কিন্তু যদি কার্য সম্পূর্ণভাবে কারণের সঙ্গে অভিন্ন হয়, তাহলে মনে হতে পারে সব কারণ থেকেই সব কার্য উৎপন্ন হতে পারে। এতে উপাদান কারণের নির্দিষ্ট নিয়ম বজায় রাখা কঠিন হয়ে যায়। এর উত্তরে সংকার্যবাদীরা বলেন— প্রত্যেক কার্যের একটি নির্দিষ্ট উপাদান কারণ আছে। সব উপাদান থেকে সব কার্য উৎপন্ন হয় না। তাই কার্য ও উপাদানের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্পর্ক অবশ্যই আছে। যদি কার্য আগে থেকে একেবারেই না থাকে (অসং হয়), তাহলে তার সঙ্গে বিদ্যমান উপাদানের কোনো সম্পর্কই সম্ভব নয়। তাই কার্যকে কোনো না কোনোভাবে বিদ্যমান বা সং মানতেই হবে।

সংকার্যবাদীদের মতে, কার্য প্রকাশের আগে শক্তিরূপে বিদ্যমান থাকে। কার্যের ভবিষ্যৎ অবস্থাই শক্তি। যে বস্তুর মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট কার্য করার শক্তি নেই, তা থেকে সেই কার্য উৎপন্ন হয় না।

কার্য উৎপন্ন হতে দুই ধরনের শক্তির প্রয়োজন হয়—

১) অবস্থিত শক্তি – যা উপাদান কারণের মধ্যেই থাকে

২) আগন্তুক শক্তি – যা বাইরে থেকে এসে যুক্ত হয়

যেমন— ঘট তৈরির ক্ষেত্রে মাটি হলো অবস্থিত শক্তি, আর দণ্ড ও চাকার সংযোগ হলো আগন্তুক শক্তি।

এখন প্রশ্ন ওঠে— এই দুই শক্তির মধ্যে কোনটি কার্যের প্রকৃত স্বরূপ?

আগন্তুক শক্তি যে কার্যের স্বরূপ নয়, তা স্পষ্ট। কিন্তু অবস্থিত শক্তিকেও যদি কার্যের স্বরূপ বলা হয়, তাহলে সমস্যা তৈরি হয়। কারণ তখন বলতে হবে কার্য থেকেই কার্য জন্মায়— যা অসম্ভব। যেমন— ঘট থেকে আবার ঘটের সৃষ্টি হয় না।

তাছাড়া আমরা বলি শক্তি থেকে কার্য উৎপন্ন হয়। যদি শক্তি আর কার্য একই জিনিস হয়, তাহলে এই বাক্যের কোনো অর্থ থাকে না। তাই বোঝা যায়, শক্তি ও কার্য এক বস্তু নয়।

আরও একটি যুক্তি দেওয়া হয়— যেমন ঘট ও শরা (মাটির আরেক ধরনের পাত্র) দুটিরই কারণ মাটি। যদি উপাদান ও কার্য এক বস্তু হয়, তাহলে ঘট ও শরাকেও একই বস্তু বলতে হয়। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। তাই বোঝা যায়, উপাদান কারণ ও কার্য সম্পূর্ণ এক নয়।

এখন সংকার্যবাদীদের মতে কারণ সত্য, কার্য মিথ্যা। এই কথার অর্থ বুঝতে হলে আগে চারটি শব্দের অর্থ জানা প্রয়োজন— কারণ, কার্য, সত্য ও মিথ্যা। ‘সং’ শব্দের অর্থ হলো যা বিদ্যমান। আর যা কখনও নিজের স্বরূপ ত্যাগ করে না, সেটিই সত্য। আদি শঙ্করাচার্য বলেছেন— যা যেকোনো নিশ্চিত হয় এবং কখনও সেই রূপ ত্যাগ করে না, তাকেই সত্য বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এক ব্যক্তি যাকে সত্য মনে করেন, অন্য কেউ তাকে মিথ্যা বলেন। এর কারণ হলো— ইন্দ্রিয়ের ভুল, পূর্বসংস্কার বা ব্যক্তিগত

প্রয়োজনের ভিন্নতা। এসব কারণে সত্য নির্ণয়ে মতভেদ দেখা যায়। সংকারণবাদীদের মতে, যা অবিনশ্বর ও অপরিবর্তনীয়, সেটিই সত্য। কিন্তু কার্য পরিবর্তনশীল— কখনো থাকে, কখনো থাকে না। তাই কার্যকে তারা সত্য বলেন না। সংকারণবাদীদের মতে কারণই সত্য। আর কার্য কারণ থেকে আলাদা নয়। যেমন— ঘট একটি কার্য এবং মাটি তার কারণ। যদি ঘট থেকে মাটিকে আলাদা করে দেওয়া হয়, তাহলে ঘড়ের আর কোনো বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না— শুধু নামমাত্র থাকে।

বৈশেষিক দর্শনের মতে আত্মা এমন একটি সত্তা যার মধ্যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, চেষ্টা (প্রযত্ন), ধর্ম, অধর্ম এবং ভাবনা—এই নয়টি বিশেষ গুণ থাকে। আবার প্রতিটি দেহে আত্মা আলাদা আলাদা। তবে আত্মা নিত্য (চিরস্থায়ী) এবং বিভূ (সর্বব্যাপী)।

মহর্ষি গৌতমের মতে, সজীব দেহের উৎপত্তিতে মাতা ও পিতার একটি অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে বলেন যে, মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তির পারস্পরিক সংযোগ ব্যতীত কোনো সজীব দেহের সৃষ্টি সম্ভব নয়। অর্থাৎ জীবদেহের উৎপত্তি একক কোনো উপাদানের দ্বারা নয়, বরং দুটি মৌলিক জীবনীশক্তির সম্মিলনের ফল।

এই মতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাৎসায়ন মুনী উল্লেখ করেন যে, “সজীব দেহের উৎপত্তিতে মাতা-পিতার নিমিত্ত্ব আছে।”— এই উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য হলো, জীবদেহের উৎপত্তি সর্বদা বীজপূর্বক, যেখানে জড় পদার্থের (যেমন পাথরের মূর্তি) উৎপত্তি বীজের মাধ্যমে ঘটে না। এখানে ‘মাতা’ ও ‘পিতা’ শব্দদ্বয় দ্বারা প্রকৃতপক্ষে বীজরূপ শুক্র (পিতৃবীজ) ও শোণিত (মাতৃবীজ) বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ জীবদেহের উৎপত্তি এই দুই বীজের সংযোগের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্রও একই মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন — “ননু মাতাপিতরৌ ন সাক্ষাৎ শরীরোৎপত্তৌ কারণমিত্যত আহমাতাপিতৃশব্দেন লোহিতরেতস ইতি।”^৭ অর্থাৎ মাতা ও পিতা সরাসরি শরীরের উৎপত্তির কারণ নয়; বরং তাদের দ্বারা উৎপন্ন শুক্র ও শোণিতই প্রকৃত উৎপত্তিকারক উপাদান। তাই ‘মাতা’ ও ‘পিতা’ শব্দদ্বয়কে যথাক্রমে শোণিত ও শুক্রের বাচক হিসেবে বুঝতে হবে। তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম হলো শরীরের উৎপত্তির মূল কারণ এই দুই বীজের সম্মিলন, মাতা-পিতা কেবল পরোক্ষ কারণ হিসেবে বিবেচিত। সুতরাং, ন্যায় দর্শনের আলোচনায় সজীব দেহের উৎপত্তি একটি বীজপূর্বক প্রক্রিয়া, যেখানে মাতৃবীজ ও পিতৃবীজের সংযোগই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

সাংখ্য দর্শনের অনুসারীরা এই বিষয়ে কিছুটা ভিন্ন মত দেন। তাদের মতে আত্মা আসলে নিগূর্ণ অর্থাৎ আত্মার মধ্যে ইচ্ছা, দ্বেষ ইত্যাদি গুণ নেই। কিন্তু তারাও মানেন যে প্রত্যেক দেহে আত্মা আলাদা এবং আত্মা সর্বব্যাপী। কারণ যদি সব দেহে একটিই আত্মা থাকত, তাহলে সমস্যা তৈরি হতো। তখন একজনের সুখ অন্যান্যের অনুভব করত, আবার একজনের পাপের ফল অন্য কেউ ভোগ করত। তাই এই বিদ্রোহী এড়ানোর জন্য তারা বলেন— প্রত্যেক দেহে আলাদা আত্মা আছে।

এখন যদি আমি নিত্য ও বিভূ আত্মা হয়েও ভীষ্ম প্রভৃতি আত্মীয়দের থেকে আলাদা হই এবং আমার মধ্যে সুখ-দুঃখের অভিজ্ঞতা থাকে, তাহলে তাদের মৃত্যু বা বিচ্ছেদের কারণে আমার দুঃখ হওয়াই স্বাভাবিক। এই রকম ভাবনা থেকেই অর্জুনের মনে শোক ও মোহ জন্মাতে পারে— এমন সম্ভাবনা ভেবে শ্রীকৃষ্ণ আত্মা ও লিঙ্গশরীরের পার্থক্য বোঝাতে শুরু করেন।

এই প্রসঙ্গে গীতায় বলা হয়েছে— ‘মাত্রাস্পর্শ’। এখানে ‘মাত্রা’ শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। অর্থাৎ যে জিনিসগুলোর দ্বারা আমরা বিষয়বস্তুকে উপলব্ধি করি। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যে সংযোগ হয় তাকে বলা হয় স্পর্শ। আরেকভাবে বলা যায়— যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনো বাহ্য বিষয় মনের (অন্তঃকরণ) সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন মন সেই বিষয়ের আকার ধারণ করে। মনের এই পরিবর্তন বা পরিণতিকেই এখানে স্পর্শ বলা হয়েছে। এই ইন্দ্রিয়-বিষয় সংযোগের ফলেই শীত, উষ্ণতা, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি জন্মায়। কিন্তু এগুলো স্থায়ী নয়— এগুলো উৎপন্ন হয় এবং পরে নষ্ট হয়ে যায়। এই সুখ-দুঃখ আসলে অন্তঃকরণের ধর্ম, আত্মার নয়। কারণ আত্মা নিত্য, নিগূর্ণ এবং অবিকারী। যেহেতু আত্মা অপরিবর্তনীয়, তাই পরিবর্তনশীল সুখ-দুঃখ তার প্রকৃত ধর্ম হতে পারে না। আরও একটি যুক্তি দেওয়া হয়— যা দৃশ্য বা জড়, তা দ্রষ্টা বা চেতনের ধর্ম হতে পারে না। সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অনুভূতি জড়প্রকৃতির অন্তঃকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু আত্মা হলো চেতন এবং সাক্ষীস্বরূপ। তাই সুখ-দুঃখ আত্মার প্রকৃত ধর্ম নয়।

যদি সুখ-দুঃখকে আত্মার ধর্ম ধরা হয়, তাহলে আত্মা পরিবর্তনশীল হয়ে যাবে। কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী আত্মা কূটস্থ, অর্থাৎ অপরিবর্তনীয়। তাই এই মত গ্রহণ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— “যা পরিবর্তনশীল, তা কখনও প্রকৃত সাক্ষী হতে পারে না।” আত্মা যেহেতু অন্তঃকরণের সব কার্যকলাপের সাক্ষী, তাই আত্মা নিজে অবিকারী। সুতরাং, সুখ-দুঃখের আসল আশ্রয় হলো অন্তঃকরণ। অন্তঃকরণের ভিন্নতার কারণেই মানুষের অভিজ্ঞতাও ভিন্ন হয়। আত্মা নিজে অবিকারী ও সর্বপ্রকাশক; সে শুধু সবকিছুর সাক্ষী মাত্র।

নাস্তিক দার্শনিকদের মতও সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। প্রথমত, চার্বাক দর্শন মতে জীবের উৎপত্তি সম্পূর্ণভাবে জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফল। এখানে কোনো আত্মা, পরজন্ম বা অতিপ্রাকৃত সত্তার প্রয়োজন নেই। পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু— এই চার উপাদানের বিশেষ সংযোগ থেকেই জীবন ও চেতনার উদ্ভব ঘটে। যেমন বিভিন্ন উপাদান মিলে মদে নেশার গুণ সৃষ্টি করে, তেমনি জড় উপাদানের সংগঠনে চেতনা প্রকাশ পায়। তাই চেতনা দেহেরই একটি গুণ; দেহ নষ্ট হলে চেতনারও বিনাশ ঘটে। দ্বিতীয়ত, জৈন দর্শন মতে জীব কোনোদিন সৃষ্টি হয় না বা ধ্বংসও হয় না; জীব অনাদি, অনন্ত ও স্বতন্ত্র সত্তা। এখানে ‘উৎপত্তি’ বলতে নতুন সৃষ্টি নয়, বরং জীবের বিভিন্ন দেহে প্রকাশকে বোঝায়। জগৎ জীব (চেতন) ও অজীব (জড়)— এই দুই ভাগে বিভক্ত। কর্ম (কর্মপুণ্ডল)—এর বন্ধনের ফলে জীব তার স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তি হারিয়ে বিভিন্ন জন্মে আবর্তিত হয়। যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন দেহ লাভ করে। এইভাবেই জীবের প্রকাশ ঘটে। তৃতীয়ত, বৌদ্ধ দর্শন জীবের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মাধ্যমে। এখানে কোনো স্থায়ী আত্মা নেই; বরং রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান— এই পাঁচ স্কন্ধের সমষ্টিতেই জীব বলা হয়। সবকিছুই কারণ-কার্য সম্পর্কের উপর নির্ভর করে উদ্ভূত হয়। অবিদ্যা থেকে শুরু করে সংস্কার, বিজ্ঞান, নাম-রূপ ইত্যাদি ক্রমে জন্ম ও জরা-মরণের চক্র গড়ে ওঠে। এই ধারাবাহিক কারণ-সম্পর্কই জীবনের উৎপত্তি ও সংসারের মূল ভিত্তি।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের মধ্যে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শন সৃষ্টি-রহস্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই দুই দর্শনেই জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে পূর্বমীমাংসা মতে জগতের কোনো সৃষ্টি বা বিনাশ নেই— জগৎ অনাদি ও অনন্ত, অর্থাৎ আজ যে নিয়মে জগৎ চলছে, অতীতেও সেইভাবেই চলেছে এবং ভবিষ্যতেও তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। মহাজাগতিক বিবর্তন বা cosmic evolution সম্পর্কে সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনে যে বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, তা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতেও যথেষ্ট মূল্যবান। সাংখ্যদর্শন অনুযায়ী, ২৫টি তত্ত্বের মাধ্যমে সৃষ্টির ধাপে ধাপে বিকাশ ঘটে— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাই হলো প্রকৃতি — “সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ।”^৮ এই প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংকার, অহংকার থেকে পঞ্চ তন্মাত্র (সূক্ষ্মভূত), একাদশ ইন্দ্রিয় (মন, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়) এবং শেষে পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়; পুরুষকে মিলিয়ে মোট ২৫টি তত্ত্ব সম্পূর্ণ হয়। সাংখ্য মতে, বিশ্বসৃষ্টির মূল হলো এই প্রকৃতি, যা বিজ্ঞানের ‘Nature’-এর মতো নয়, কারণ এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এবং সৃষ্টির আগেও অব্যক্ত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; তখন এটি ক্রিয়াহীন, দেশ-কালাতীত এবং ত্রিগুণের সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে। বিজ্ঞানের ‘Nature’ দেশ-কাল নির্ভর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও সাংখ্যের ‘প্রকৃতি’ ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরা যায় না, এটি ধ্যানের মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়; তবু জগতে যা কিছু আছে, সবকিছুরই আদি মূল বা বীজ এই প্রকৃতি। প্রকৃতি তিন গুণ— সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এর সমন্বয়ে গঠিত, কিন্তু সৃষ্টির আগে এই তিন গুণ সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায় থাকায় কোনো কিছুর প্রকাশ ঘটে না, এটিই অব্যক্ত অবস্থা। পরে পুরুষের সান্নিধ্যে এই সাম্যভঙ্গ হলে প্রথমে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যে ‘মহত্তত্ত্ব’ বা মহাজাগতিক চেতনার উদ্ভব হয়— এটাই সৃষ্টির প্রথম

৭. ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা* নিউ দিল্লি: ভারতীয়দার্শনিকানুসন্ধান পরিষৎপ্রকাশিতা, ১৯৯৬, পৃঃ ৫৪৫।

৮. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। *সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র)*। কলকাতা: বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ২০২১, পৃঃ ২৩।

প্রকাশ। এরপর মহত্ত্ব ক্রিয়াশীল হয়ে ‘অহংকার’-এ পরিণত হয়, যেখানে মহাজাগতিক স্তর থেকে ব্যক্তিগত ‘আমি’-বোধের সৃষ্টি ঘটে। এই অহংকার আবার দুই রূপে প্রকাশ পায়—রাজসিক (অস্মিতা) ও তামসিক (তন্মাত্র); রাজসিক অহংকার থেকে মনসহ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় মোট একাদশ ইন্দ্রিয়ার উৎপত্তি হয়, আর তামসিক অহংকার থেকে সূক্ষ্মভূত ও স্বেচ্ছা থেকে পঞ্চ স্থূলভূতের সৃষ্টি হয়। এই একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ স্থূলভূতের মিলনে জীবদেহ গঠিত হয়, এবং সেই দেহেই পুরুষ বা চৈতন্য আত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। বিজ্ঞানে ইন্দ্রিয় ও স্থূলভূতের মিলন না হলেও জড় বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সাংখ্য মতে জড় থেকে কখনো চেতন জীবের সৃষ্টি হয় না; মন, বুদ্ধি ও চেতনা প্রকৃতির বিকাশ হলেও এগুলো নিছক জড় থেকে আসে না। তবে আধুনিক বিজ্ঞান ভিন্ন কথা বলে— তাদের মতে মন, বুদ্ধি ও চেতনার আলাদা কোনো স্বতন্ত্র সত্তা নেই, বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে এগুলো জড় পদার্থেরই এক ধরনের জটিল ধর্ম হিসেবে প্রকাশ পায়। যেমন— হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও ফসফরাস— এই সবই জড় পরমাণু, কিন্তু এগুলো যখন বিপুল সংখ্যায় এক বিশেষ গঠনে যুক্ত হয়, তখন ডিএনএ-এর মতো জটিল অণু তৈরি হয়, যেখানে জীবনের লক্ষণ দেখা যায়। এভাবে পরমাণু থেকে অণু, অণু থেকে আরও জটিল গঠন তৈরি হয়ে জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। বিজ্ঞানীরা বলেন, বিশ্বজগতের সব মৌলিক পদার্থ মূলত হাইড্রোজেন থেকেই এসেছে: আর এই হাইড্রোজেন তৈরি হয় প্রোটন ও ইলেকট্রনের সমন্বয়ে। আবার প্রোটন ও ইলেকট্রনের উৎস হিসেবে ধরা হয় শক্তিকণিকা ফোটনকে, অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত জড় ও শক্তির মধ্যে এক ধরনের পারস্পরিক রূপান্তরের সম্পর্কই এখানে কাজ করে।

জড় হাইড্রোজেন থেকে যখন বিভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়, তখন প্রচুর শক্তিকণিকা বা ফোটন উৎপন্ন হয়; Albert Einstein-এর সূত্র অনুযায়ী জড় থেকে শক্তি ($E=mc^2$) এবং শক্তি থেকে জড়— এই দুইয়ের মধ্যে সবসময় রূপান্তর চলতেই থাকে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, যদি জড় ও শক্তির মধ্যে এই আদান-প্রদান ঘটে, তবে প্রথম সচেতন প্রাণের সৃষ্টি হলো কীভাবে? বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, বিভিন্ন জড় পরমাণু একত্রিত হয়ে নানা ধরনের অণু তৈরি করে এবং সেই অণু ও শক্তির জটিল সমন্বয়ে জীবাত্মার মতো জীবনের প্রাথমিক রূপও গড়ে উঠতে পারে। বৈজ্ঞানিক ধারণা অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে ছিল কিছু মৌলিক কণিকা, কিছু তড়িৎযুক্ত, কিছু তড়িৎহীন এবং শক্তি; এদের মিলন থেকেই তৈরি হয় হাইড্রোজেন, যা আজও মহাবিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ। পরে হাইড্রোজেনের সংযোজন থেকে হিলিয়াম ও বিপুল শক্তির সৃষ্টি হয় ($H + H \rightarrow He + \text{শক্তি}$), যা অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রা তৈরি করে। এই উত্তপ্ত গ্যাস ঘুরতে ঘুরতে নীহারিকাপুঞ্জ তৈরি করে, আর সেই নীহারিকা থেকেই তড়িৎচুম্বকীয় ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়—যেগুলো প্রথমদিকে অত্যন্ত উত্তপ্ত অবস্থায় ছিল। প্রথমে উত্তপ্ত হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে হিলিয়াম এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, আর সেই সঙ্গে পৃথিবী ক্রমে ঠান্ডা হয়ে ঘনীভূত হতে থাকে। ভারী উপাদান যেমন লোহা ও নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রে জমা হয়, আর তুলনামূলক হালকা উপাদান যেমন সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পাথর-বালির মতো বস্তু তৈরি করে; আরও হালকা উপাদান— হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন—মিলে গড়ে ওঠে বায়ুমণ্ডল। এই সময়েই জলীয় বাষ্প (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3) ও মিথেন (CH_4) তৈরি হয় এবং প্রাচীন পৃথিবীর আবহমণ্ডলে এগুলো প্রচুর পরিমাণে ছিল। পৃথিবী আরও ঠান্ডা হলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি হয়ে নদী, হ্রদ, সাগর ও মহাসাগরের সৃষ্টি করে; একই সঙ্গে অ্যামোনিয়া ও মিথেন বৃষ্টির জলে মিশে খনিজ পদার্থের সঙ্গে সমুদ্রে গিয়ে জলের গঠনকে আরও জটিল করে তোলে এবং সমুদ্র ধীরে ধীরে লবণাক্ত হয়। তখন ঘন মেঘের কারণে সূর্যের আলো ঠিকমতো পৌঁছাত না, তাই দিন-রাত্রি বা ঋতুর স্পষ্ট বিভাজন ছিল না; চারদিকে ছিল শুধু সমুদ্র, বালি ও পর্বত, কিন্তু কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব ছিল না। তবে এই প্রাণহীন অবস্থাতেই নানা রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে সরল জৈব অণু তৈরি হয়, আর সেগুলো ধীরে ধীরে মিলিত হয়ে আরও জটিল অণু গঠন করে, যা পরবর্তীকালে জীবনের উদ্ভবের ভিত্তি তৈরি করে।

জীবদেহ গঠনের জন্য কয়েকটি মৌলিক জৈব উপাদান দরকার, যেমন শর্করা, গ্লিসারিন ও ফ্যাটি অ্যাসিড (যা মিলে চর্বি তৈরি করে), অ্যামিনো অ্যাসিড (যা থেকে প্রোটিন ও এনজাইম গড়ে ওঠে), এবং পিরিমিডিন ও পিউরিন (যা থেকে নিউক্লিওটাইড ও পরে নিউক্লিক অ্যাসিড তৈরি হয়)। এই সব উপাদানই আদিম পৃথিবীর মিথেন, জল, অ্যামোনিয়া ও বিভিন্ন শক্তির (তাপ, আলো, অতিবেগুনি রশ্মি) প্রভাবে তৈরি হয়েছিল। প্রথমে সরল জৈব অণু তৈরি হয়, তারপর সেগুলো মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে জটিল অণুতে পরিণত হয়—যেমন অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে প্রোটিন, নিউক্লিওটাইড থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড, আর এগুলো একত্র হয়ে তৈরি করে নিউক্লিওপ্রোটিন। বিজ্ঞানীদের মতে, এই নিউক্লিওপ্রোটিনেই প্রথম জীবনের সূচনা ঘটে, কারণ এদের এমন ক্ষমতা ছিল যে সমুদ্রের জল থেকে উপাদান নিয়ে নিজেদের মতো আরও অণু তৈরি করতে পারত—অর্থাৎ এক ধরনের স্ব-প্রতিলিপি গঠন সম্ভব হয়েছিল। ফলে এক থেকে দুই, দুই থেকে চার—এইভাবে অসংখ্য অণুর সৃষ্টি হতে থাকে। পরে পরিবেশের পরিবর্তন ও চাপের কারণে এই নিউক্লিওপ্রোটিনগুলির মধ্যে নানা রকম পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটে এবং ধীরে ধীরে আরও উন্নত গঠন তৈরি হয়। সম্ভবত এইভাবেই বহু নিউক্লিওপ্রোটিন একত্র হয়ে একসময় প্রোটোভাইরাসের মতো প্রথম জীবন্ত সত্তার জন্ম দেয়, যা জীবনের বিবর্তনের একেবারে প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ধরা হয়। প্রোটোভাইরাসের আরও উন্নত রূপ হলো ভাইরাস, যা জড় ও জীবন্তের মাঝামাঝি এক অদ্ভুত অবস্থা; জীবদেহের বাইরে এটি প্রায় জড়ের মতো নিষ্ক্রিয়, কিন্তু জীবদেহে প্রবেশ করলে জীবন্তের মতো আচরণ করে এবং পরজীবী হিসেবে বেঁচে থাকে। বিবর্তনের ধারায় প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে নিউক্লিওপ্রোটিন ধীরে ধীরে নিজেদের চারপাশে আবরণ তৈরি করে এবং খাদ্য গ্রহণের ক্ষমতা অর্জন করে; এর ফলে প্রথমে নিউক্লিয়াসহীন কোষ বা ব্যাকটেরিয়ার জন্ম হয়, পরে নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষ বা প্রোটোজোয়ার সৃষ্টি হয়। এইভাবে নিউক্লিওপ্রোটিন → প্রোটোভাইরাস → ভাইরাস → ব্যাকটেরিয়া → প্রোটোজোয়া—এই ধারায় জীবনের ক্রমবিকাশ ঘটে। ধীরে ধীরে অজৈব পদার্থ থেকে জীব, ক্ষুদ্র জীব থেকে জটিল জীব, এবং নানা পরিবেশগত চাপে অসংখ্য রূপের প্রাণের উদ্ভব হয়। এই দীর্ঘ বিবর্তনের পথ পেরিয়ে মানুষের দেহ গড়ে ওঠে, যেখানে শুধু দেহ নয়, মানসিক শক্তিরও বিকাশ ঘটে— উদ্ভিদের সহজ প্রবণতা থেকে প্রাণীর প্রবৃত্তি, আর সেখান থেকে মানুষের মধ্যে চেতনা বা আত্মসচেতনতার উন্মেষ ঘটে। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বিজ্ঞানের মতে সমগ্র বিশ্ব জড় ও শক্তির সমন্বয়ে গঠিত, এবং অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন— এই জড় ও শক্তিও হয়তো কোনো এক গভীরতর মৌলিক বাস্তবতারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যদিও সেই মূল সত্তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখনও বিজ্ঞান দিতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে ফরাসি দার্শনিক Henri Bergson-এর উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি দার্শনিক হলেও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সুপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন যুক্তি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, প্রকৃতির অন্তরালে একটি প্রচ্ছন্ন সৃজনশীল শক্তি ক্রিয়াশীল যাকে তিনি ‘Elan Vital’ নামে অভিহিত করেছেন। বার্গসনের মতে, এই ‘Elan Vital’-এর মধ্যে একটি মৌলিক প্রেরণা (original impulse), অন্তর্গত চালনা (internal push) এবং সৃষ্টিশীল উদ্দীপনা নিহিত আছে। এই অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণাতেই Creative Evolution-এ বর্ণিত সৃষ্টিশীল বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ ‘Elan Vital’-এর গতিশীল প্রভাবেই সমগ্র প্রকৃতি নিরবচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট গতিতে সৃষ্টির বৈচিত্র্যময় বিবর্তনের পথে অগ্রসর হচ্ছে— “There is an internal push that has carried life, by more and more complex forms to higher and higher destinies. It begins to be evident that there is something of the psychological order, immanent in all things,

low as well as high, which feels and strives and achieves.”⁹ এইভাবে বার্গসন প্রকৃতির বিবর্তনকে কেবল যান্ত্রিক বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, এক অন্তর্নিহিত সৃজনশীল শক্তির আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায়, ভারতীয় দর্শনে জগত ও জীবের উৎপত্তি মূলত পরিবর্তন, বিকাশ ও কারণ-কার্য সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যাখ্যাত। পঞ্চভূত, ইন্দ্রিয় ও চেতনার সমন্বয়ে দেহ ও অভিজ্ঞতার গঠন ঘটে, আর বিভিন্ন দর্শন এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করে— সাংখ্য দর্শন সংস্কারবাদ, ন্যায় দর্শন অসংস্কারবাদ এবং বেদান্ত দর্শন বিবর্তবাদ প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে বিজ্ঞান জড় ও শক্তির বিবর্তনের মাধ্যমে জীবনের ব্যাখ্যা দেয়। সব মিলিয়ে, স্থূল থেকে সূক্ষ্ম এবং কারণের দিকে অগ্রসর হওয়াই এই চিন্তার মূল সূত্র। ভারতীয় দর্শনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো ‘উৎপত্তি’ বা creation ধারণাটি পাশ্চাত্য অর্থে গ্রহণ করা হয় না। অর্থাৎ সম্পূর্ণ নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি হয়—এমন ধারণা ভারতীয় দার্শনিকরা সাধারণত স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, জগতে যা কিছু আছে, তা পূর্ব থেকেই কোনো না কোনো রূপে বিদ্যমান; কেবল তার রূপান্তর বা প্রকাশভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। এই রূপান্তরকেই বলা হয় ‘ক্রমবিকাশ’ বা evolution। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, জগতের কোনো বস্তুর প্রকৃত অর্থে সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না; বরং এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় তার পরিবর্তন ঘটে মাত্র। ফলে ‘creation’ এবং ‘destruction’—এই দুটি পাশ্চাত্য পরিভাষার যথার্থ প্রতিশব্দ ভারতীয় দর্শনে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এখানে মূল জোর দেওয়া হয় ‘পরিবর্তন’ বা ‘বিকাশ’-এর উপর। এই ক্রমবিকাশের ধারণা ভারতীয় দর্শনে অত্যন্ত প্রাচীন এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে সাংখ্য দর্শন-এ এই তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সাংখ্য মতে, প্রকৃতির (প্রকৃতি) অন্তর্নিহিত গুণত্রয়ের বিকাশের মাধ্যমেই জগতের বিভিন্ন তত্ত্ব ও পদার্থ ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে মুণ্ডক উপনিষদ-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্র উল্লেখযোগ্য — “তপস্যা চীয়েত ব্রহ্ম ততোহন্নমজিভায়তে। অন্নং প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসূ চামৃতম্”¹⁰ (১/১/৮) এই মন্ত্রের অর্থ হলো ব্রহ্ম তাঁর তপশক্তি (অর্থাৎ সৃজনোন্মুক্ত চৈতন্যশক্তি) দ্বারা নিজেকে প্রসারিত করেন। সেই প্রসারণ থেকে ‘অন্ন’ বা জড় পদার্থের উদ্ভব হয়; অন্ন থেকে প্রাণের, প্রাণ থেকে মনের উদ্ভব ঘটে (মানুষ সৃষ্টি হলো); এবং এইভাবে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন লোক বা জগতের প্রকাশ ঘটে। এখানে লক্ষ্যণীয়, এই প্রক্রিয়ায় কোথাও সম্পূর্ণ নতুন কিছু হঠাৎ সৃষ্টি নয়, বরং এক ধারাবাহিক বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এই ভাবনাকেই আধুনিক ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন শ্রীঅরবিন্দ। তাঁর মতে — “By energism of consciousness, Brahman is massed; from that Matter is born, and from Matter Life and Mind and the Worlds”¹¹

গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) :

- ১। অভেদানন্দ, স্বামী। *আত্মজ্ঞান কলকাতা*: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৯১।
- ২। অভেদানন্দ, স্বামী। *মরণের পারে* কলকাতা: শ্রী রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯৯১।
- ৩। অমৃতদ্বন্দ্ব, স্বামী। *বেদান্তসারঃ (অনুবাদ ও টীকা)*। কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৮।
- ৪। আচার্য, ড. সুদ্যুম্ন। *ভারতীয় দর্শন তথা আধুনিক বিজ্ঞান* মধ্যপ্রদেশ: বেদ বাণী বিতানম্, ২০১৭।
- ৫। আরণ্য, স্বামী হরিরহানন্দ। *কর্মতত্ত্বা বিহার*: কাপিল মঠ, ১৩৬৯ (বঙ্গাব্দ)।
- ৬। গোস্বামী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র। *তর্কসংগ্রহঃ (অন্নং ভট্টা)*। কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯১৩ (বঙ্গাব্দ)।
- ৭। চট্টোপাধ্যায়, গুরুপ্রসাদ। *বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মজ্ঞান* দুর্গাপুর: AASETS, ১৯৭০।
- ৮। ঝলকীকর, ভীমাচার্য। *ন্যায়কোশ* বারাণসী : চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ২০২১।
- ৯। ঠাকুর, অনন্তলাল। *ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটিকা* নিউ দিল্লি: ভারতীয়দার্শনিকানুসন্ধান পরিষৎপ্রকাশিতা, ১৯৯৬।
- ১০। দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। *উপনিষদ জড় ও জীবতত্ত্ব* কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ)।
- ১১। নিগুড়ানন্দ। *জীবাত্মা রহস্য* কলকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০১৪।
- ১২। প্রামাণিক, প্রশান্ত। *ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান* আগরতলা: জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, ২০০৩।
- ১৩। বেদান্তবাবীশ, কালীবর। *পরলোক-রহস্য* কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ১৯৪১।
- ১৪। ব্রহ্মচারী, রামেশ্বরানন্দ। *পরলোক (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)*। কলকাতা: মহালক্ষী প্রেস, ১৯৫৩।
- ১৫। ভট্টাচার্য, অধ্যাপক অমিত। *বৈশেষিক দর্শন (সম্পাদিত)*। কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১২।
- ১৬। মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। *সাংখ্যদর্শন (সাংখ্যপ্রবচন সূত্র)*। কলকাতা: বসুমতি সাহিত্য মন্দির, ২০২১।
- ১৭। রামসুখদাস, স্বামী। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* গোরখপুর: গীতা প্রেস, ২০১১।
- ১৮। সিদ্ধান্তশাস্ত্রী, শ্রীরবীন্দ্রকুমার। *পরলোকতত্ত্ব ও জন্মান্তরবাদ* কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৯৩২ (বঙ্গাব্দ)।
- ১৯। সেন, অতুল চন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র। *উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৩।

৯. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ। *উপনিষদ জড় ও জীবতত্ত্ব* কলকাতা: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ১৩৫৯ (বঙ্গাব্দ), পৃঃ ৫২।
১০. সেন, অতুল চন্দ্র, তত্ত্বভূষণ, সীতানাথ ও ঘোষ, মহেশচন্দ্র। *উপনিষদ (অখণ্ড সংস্করণ)*। কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ২০১৩, পৃঃ ২১৩।
১১. প্রামাণিক, প্রশান্ত। *ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান* আগরতলা: জ্ঞানবিচিত্রা প্রকাশনী, ২০০৩, পৃঃ ২৬।